নাটক

ঘেরাটোপ

সপ্তর্ষি মণ্ডল

রমা	: বিধবা, বয়স চল্লিশ
ঋক	: রমার পুত্র, বয়স বারো
মাস্টার	: ঋকের বাড়ির শিক্ষক, বয়স ত্রিশ
রতন	: রমার বন্ধু, বয়স পঁয়তাল্লিশ
পুরোহিত	:
শাশুড়ি	: রমার শাশুড়ি
প্রথম ননদ	: রমার ননদ
দ্বিতীয় ননদ	: রমার ননদ
মৌ	: ঋকের স্ত্রী
অর্ক	: ঋকের পুত্র
রমার মা	:
সুধাময়	: রমার স্বামী

প্রথম দৃশ্য

[বিকেল পাঁচটা। মধ্যবিত্ত পাড়ার একটি পাকা বাড়ি, যার বয়স চার বছর। খুব খারাপ নয়, কিন্তু গোছানো নয় বসবার ঘর। দেয়ালে কোনো ছবি নেই। ং একটি ড়ি, ক্যালেন্ডার। রমা একজন বিধবা, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। দেখতে ফরসা, লম্বা গড়নের, সুশ্রী। আকর্ষণীয়া। কিন্তু বড়ো এলোমেলো। পোশাকে আভিজাত্যের ছাপ নেই। সাদামাঠা, সস্তাই বলা যায়। মোবাইলে কথা বলছেন।]

রমা : কী বলছেন? একজন বিধবাকে এরকম কথা বলতে আপনার লজ্জা লাগে না! আপনার কি মতিভ্রম হয়েছে? আপনি অধ্যাপক মানুষ, সংসার আছে। অথচ এরকম খারাপ কথা বলার আগে আপনি একবারও ভাবলেন না? [বিরক্তির সঙ্গে গলার স্বর তীব্র হয়ে ওঠে]। না, আপনার কাছে কোনো উপকার পাবার জন্য যাব না। উপকার করার অজুহাতে এরকম খোলস পরে থাকেন? শুনুন, আমি এসব কিছুই ভাবছি না। আমাকে শান্তিতে বাঁচতে দিন। অনেক প্রলোভন দেখিয়েছেন। আমি সামান্য ডালভাতেই সন্তুষ্ট আছি। আপনি বরং ... [হঠাৎ দরজায় শব্দ হল। রমার ছেলে, ঋকের প্রবেশ]

ঋক : মা, টিভিটা দেখব। [টিভি চালায়], টিভিটা আবার খারাপ হয়ে গেছে। মেকানিককে খবর দিয়ো। কী খাব এখন? চাউমিন আছে? চাউমিন করে দাও।

রমা : না, বাবা, চাউমিন নেই। তুই বরং বিস্কুট খা। দ্যাখ কৌটোতে ক্রিম বিস্কুট আছে। তোর

কাকু নিয়ে এসেছে।

ঋক : কাকু কবে আসবে? কাকুকে বলবে এবার যখন আসবে, আমার জন্য একটা ঘড়ি আনতে।

রমা : আচ্ছা বলব, নিজেও তো বলতে পারিস। কাকু তোকে কত ভালোবাসে!

ঋক : না, কাকু তোমাকে ভালোবাসে। তোমাকে কত কিছু কিনে দেয়। আমাদের বাড়ি এলে তোমার সঙ্গেই কাকু গল্প করে।

রমা : তোকেও তো ভালোবাসে। তোকে কত কিছু দিয়েছে। যা, ওঘরে গিয়ে পড়তে বস। মাসাই এখনি আসবে।

ঋক : না, মাসাই আসতে দেরি আছে। কাল আমাকে বলে গেছে, মাসাই-এর নাটক আছে আজকে।

[রমার মোবাইল বেজে ওঠে। রমা মোবাইলে কথা বলতে শুরু করে। ঋকের প্রস্থান]

রমা : হ্যাঁ বলুন, নিখিলদা। ও আচ্ছা। কালকে স্কুলে ইনস্পেকটর সাহেব আসবেন? কখন আসবেন। ওঃ, দুপুরের পরে? ঠিক আছে। আমি সকাল সকাল স্কুলে যাব। মাসিকে দিয়ে সব ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখব। সুইপারকে দিয়ে সব ভালোভাবে পরিষ্কার করে রাখব। সব ক্লাসে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের দশ মিনিটের একটা টিচিংস্ দেব, যাতে ওরা মার্জিত থাকে। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। ও, কী বললেন, উনি অ্যাকাউন্টসের খাতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চেকিং করবেন? করুন না। নরেশ আমাদের ভালো অ্যাকাউন্টট্যান্ট। ও সব হিসাব পরিষ্কারভাবে লিখে রাখে। সমস্ত ভাউচার ঠিকঠাকভাবে রাখা আছে। সার্ভিস বুকগুলো সব ঠিক আছে। আমি দেখেছি। আচ্ছা এখন রাখছি। কী বললেন? (বিরক্তি) শেষের কথাটি না বললেই ভালো করতেন। আপনি প্রধান শিক্ষক আমাদের স্কুলের। তার ওপর আটান্ন বছর বয়েস। কী বললেন বয়েস হয়েছে তো কী হয়েছে? না না, এরকম কথা আমার সঙ্গে বলবেন না। আমি কিন্তু কমলা নই। হ্যাঁ, রাখছি।

[দরজায় কলিং বেল বেজে ওঠে। দরজা খোলার আওয়াজ হয়। ধীরে ধীরে প্রবেশ করে ঋকের মাস্টার]

রমা : মাস্টার এসেছো! ঋক, এ ঘরে চলে এসো, মাস্টার এসেছে। বসো মাস্টার। আজ ভীষণ গরম পড়েছে। এই অন্ধকারে কুকুরগুলো রাস্তায় বড়োই জ্বালায়। আজ তোমাকে কোনো কুকুর তাড়া করেনি তো! [ইশারায় মাস্টার জানায় যে কোনো কুকুর তাড়া করেনি] অথচ দেখো, এই কুকুরগুলোর দরকার আছে। হয়তো মারাত্মক কোনো ক্ষতি থেকে এরা কিছুই রক্ষা করতে পারবে না, তবু চোরেরা কিছু তো ভয় পাবেই। কিংবা ধরো, নোংরা ছেলেরা, যাদের কাজ হল মানুষদের, বিশেষত মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা, তাদের জন্য এই কুকুরগুলোর ভীষণ দরকার। আচ্ছা বলতে পারো মাস্টার, ঋক এখন কেমন পড়াশুনো করছে?

মাস্টার : ঋকের কোনো দোষ নেই। ওর বয়েস মাত্র বারো বছর। এই বয়েসে ও যে আঘাত পেয়েছে, যে-কোনো মানুষের পক্ষে তা সহ্য করা কষ্টকর। ও কতটুকু পেল ওর বাবাকে? বাল্যজীবন বাবা-মায়ের স্নেহ-ছায়ায় লালিত হয় সবার। অথচ দেখুন দিদিমণি, ও কিন্তু বাবার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হল। এর মধ্যে যে নম্বর পেয়ে ক্লাস সিক্সে উঠেছে তা কিন্তু যথেষ্ট ভালো। এখন আপনিই ওর মা এবং বাবা। যদিও আপনি মারাত্মকভাবে দংশিত। জীবন-যন্ত্রণার বিষে জর্জরিত আপনি, তবু আপনাকে সব কিছু ভুলে, ঋককে আনন্দ দিতে হবে। ঋকের জন্য সময় দিতে হবে। ঋকের ভালোর জন্য ভাবতে হবে। শুধুমাত্র ঋকের কথা ভেবে

নিজেকে তৈরি থাকতে হবে। আমি গত চার বছর ধরে ঋককে পড়াচ্ছি। ওর বাবাই আমাকে খুঁজে এনেছেন। আপনাদের সংসারের একজন হয়ে উঠেছি। ঋককে আমি যেমন চিনি, আশা করি আপনি তত কি চেনেন? ঋকের অন্তরে আমি ঢুকে যেতে পারি। আমি কিন্তু শুধু পয়সার জন্য ঋককে পড়াই না। সুধাময়দার ইচ্ছে ছিল ঋক বড়ো হয়ে ওর বাবার থেকেও বড়ো উকিল হবে। সুধাময়দা আমাদের বহরমপুর এলাকায় বহুল প্রচারিত ব্যক্তি, উনি অনেকের উপকার করেছেন। কোর্ট এলাকায় প্রচুর নামডাক। উনি সবসময় অন্যের কথাই ভাবতেন।

রমা : তুমি ঠিক বলেছো মাস্টার। কিন্তু তুমি কি জানো, ও যে-কোনো কারণেই হোক, নিজের বউকে, ছেলেকে সেভাবে সময় দিতে পারেনি। অর্থ উপার্জন করেছে, কিন্তু তা খরচ করে ফেলেছে সবই নিজের পৈতৃক বাড়িঘরের লোকজনেদের জন্য। হ্যাঁ, ওর অন্য উপায় ছিল না। ওর সৎমায়ের চাপে পড়ে ওকে সুযোগ দেওয়া হয়নি স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে। এমনকি ওর নিজেরও ইচ্ছে ছিল না স্ত্রী-পুত্রকে আরও একটু ভালো রাখি।

মাস্টার : কিন্তু দিদিমণি, সুধাদা তো নিয়মিত বাজার করতেন। ভালো-মন্দ আনতেন। ঋক তখন মাছ-মাংস ছাড়া কোনোদিন ভাত খেত না। অথচ দেখুন, আপনি কিন্তু এখন তেমনভাবে ঋককে ভালো খাওয়াতে পারেন না।

রমা : [বিরক্তি প্রকাশ করে] শোনো ভাই মাস্টার, আমি সামান্য একটি প্রাথমিক স্কুলে মাস্টারি করি। কত মাইনে সে তো সকলেই জানে। তার ওপর ঋকের বাবা দুই ব্যাংকে প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা লোন রেখে গেছে।

মাস্টার : এত টাকা সুধাদা কী করেছেন কোথায় খরচ করেছেন? আমি তো জানি ওঁর কোনো খারাপ স্বভাব ছিল না। এছাড়া তিনি শুধু পড়াশুনো নিয়েই থেকেছেন।

রমা : হ্যাঁ, ঋকের বাবার স্বভাব-চরিত্র খুব ভালো। আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু যেদিন ও হঠাৎই মারা গেল, সেদিনও আমি জানতাম না যে ও এত টাকা লোন করে গেছে। গত বছর, ও মারা যাবার চার-পাঁচদিন পরেই দেবগ্রামের দুটো ব্যাংক থেকে চিঠি এল যে সুধাময় মোট সাড়ে চার লাখ টাকা লোন করে গেছে। আমি জানতামও না, অথচ আমি ছিলাম গ্যারান্টার। সঠিক তথ্য গোপন করে ও আমার সই নিয়ে জমা দিয়েছে ব্যাংকে।

মাস্টার : সুধাদা কী করেছেন এত টাকা? (বিস্ময় সহ)

রমা : ও এক বোনকে বিয়ে দিয়েছে। এছাড়া দুই ভাইকে পড়াশুনো শিখিয়েছে। ভাই-বোনেদের জামাকাপড়, নানারকম দামি শৌখিন জিনিস কিনে দিয়েছে। অথচ এসব কিছুই আমি জানতাম না। (হতাশ কণ্ঠস্বরে) আর এখন আমাকে সেই টাকা প্রতিমাসে শোধ দিতে হচ্ছে প্রায় না খেয়েই।

মাস্টার : না দিদিমণি, এ আপনার কল্পনা। সুধাদা সেই টাকা খরচ করে এই বাড়িটা করেছেন। ক্লায়েন্টদের জন্য উকিল-চেম্বার বানিয়েছেন। চেম্বার ভরতি বইপত্র। ঘরভরতি আসবাব। এসব সুধাদা করেছেন ওর আয় থেকে এবং লোন থেকে।

রমা : তুমি ভুল ভাবছো। এই বাড়িটা আমার বাবা করে দিয়েছে। এমনকি যে জমির ওপর বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, সে জমিটার টাকা বাবা দিয়েছে। অথচ দেখো মাস্টার, জমির কাগজপত্র ঠিক করে যায়নি। উকিল হয়েও ত্রুটিপূর্ণ জমি কিনেছে এবং সেই জমি এখন আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। সরকারি অফিসে কতবার গিয়েছি, অথচ এখনও ঠিক করতে পারছি না জমির কাগজপত্র।

মাস্টার : কেন?

রমা : বি-এল. আর. ও. অফিস পরোক্ষভাবে লাখ টাকা ঘুষ চেয়েছে। এই টাকাটা না দিলে ওই বাড়ি আমার নামে নামপত্তন হবে না। অথচ যখন আমি নতুন বউ হয়ে গিয়েছি শ্বশুরবাড়ি, একেবারে অবুঝ মেয়ে ছিলাম। সরল মনটা নিয়ে গিয়ে ভেবেছিলাম, স্বামীর অনুগত থাকব। আমি শহরে মানুষ হয়েছি। কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে স্নাতক হয়েছি। পড়াশুনা ছাড়া কিছুই শিখিনি। সেই কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে এসে উঠোন ঝাঁট দেওয়া, গোরুর গোবর দিয়ে উঠোন লেপা, রান্না করা কত কিছুই না শিখেছি। শুধু শেখা নয়, গ্রাম্য বধূ হিসেবে সব কিছুই করতে হতো। আমি হেরে যেতে চাইনি। বাপের বাড়ি ফিরে যাব সে সাহসও ছিল না আমার। আমার সরলতার সুযোগ নিয়ে তোমাদের সুধাময়দা কতগুলো লোনের বোঝা আমার মাথায় দিয়ে গেছে।

মাস্টার : শুনেছি আপনি দেবগ্রামের বাড়িতে ভালোই ছিলেন। সুধাদা আপনাদের নিয়ে কত জায়গায় বেড়াতে গিয়েছেন! ঋককে দাদা বড়ো ভালোবাসতেন। দাদার আয়ের টাকায় তো আপনাদের ভালোই চলত জানি।

রমা : তুমি কিছুটা জানো। তুমি কি জানো, শ্বশুরবাড়িতে আমি ঋক আর শ্বশুরকে নিয়ে থাকতাম আর তোমাদের সুধাদা তার ভাইদের, বোনদের এবং সৎমাকে নিয়ে দেশের নানা জায়গায় বেড়াতে যেত। কোনোদিন কোনো উপহার আনেনি আমাদের দুজনের জন্য। এমনকি তোমাদের সুধাদা চায়নি আমার সন্তান জন্ম নিক। কারণ সন্তান হলেই তার দায়িত্ব বেড়ে যাবে। আর এসব যখন বুঝতে পারলাম, আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম, একটা চাকরি জোগাড় করতে হবে। শুরু করলাম চাকরি পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা। দু-বছরের চেষ্টায় এই চাকরিটা পেয়ে গেলাম। তুমি কি জানো, চাকরি পাবার পর আমি দীর্ঘ এগারো বছর বেতন নিজের হাতে পাইনি! প্রতি মাসে আমি চেক সই করে দিতাম আর তোমার সুধাময়দা ব্যাংকে গিয়ে বেতনটা তুলে নিত। হাত খরচ আমার বরাদ্দ ছিল পাঁচশো টাকা মাসে। [হঠাৎ ঝন করে বাসন পড়ার শব্দ হল পাশের ঘর থেকে। রমা চিৎকার করতে করতে পাশের ঘরে চলে গেল এবং স্টেজে অন্ধকার নেমে আসে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রমার বসার ঘর। রমা চেয়ারে বসে আছে। হাতে কিছু কাগজ। অন্য পাশে একজন বছর পঁয়তাল্লিশের মানুষ। সোফায় বসে। সে রমার বন্ধু, যাকে ঋক কাকু বলে]

রতন : (দীর্ঘশ্বাস নিতে নিতে) আজকের বাতাস ভীষণ গরম। বাসস্ট্যান্ড থেকে হেঁটে এলাম। কোনো রিকশা পেলাম না। শুধুমাত্র তোমার টানেই দু-ঘণ্টার ট্রেন জার্নি করে এলাম। ট্রেনে বসে ভাবছিলাম, তুমি কি এখনও তেমনি রোগা আছো? চুলে দেখছি শ্যাম্পুও করো না। এভাবে অগোছালো থাকতে কি ভালো লাগে? তুমি ভালোই জানো, ঋককে নিয়ে তোমাকে চলতে হবে অনেক বছর। সুস্থভাবে। তুমি যদি এভাবে ভেঙে পড়ো, তবে মনের জোর তোমার হারিয়ে যাবে। নিজেকে পরিবর্তন করো। শক্ত হও। লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কোনো অবস্থাতে নরম হওয়া চলবে না।

রমা : আমি আর পারছি না। সুধাময় ব্যাংকের হয়ে অনেক কাজ করেছে, অথচ কোনো টাকাই এখনও পেল না। ওর তৈরি বিল জমা দিলাম — অথচ ব্যাংক চুপচাপ রয়ে গেল। ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির কাছেও অনেক টাকা পাওনা বাকি। সুধাময় ইনশিয়োরেন্সের বিল তৈরি করে

যেতে পারেনি। ফলে ইনশিয়োরেন্স কোম্পানি আমার প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না। এই টাকাগুলো পেলে লোনের অঙ্কটা কমানো যেত। এত চিন্তায় আমার রাতে ঘুম আসে না। অন্ধকার দেখতে দেখতে ভোরের আলো ফুটে ওঠে। আর তুমি বলো, আমাকে আনন্দে থাকতে হবে? কীভাবে থাকব বলো? [বলতে বলতে রমার দুগাল বেয়ে জলের ফোঁটা নামতে থাকে। রতন হঠাৎ বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। রমার কাছে এগিয়ে যায়, দুগালের জল মুছিয়ে দেয় হাত দিয়ে এবং সেই মুহূর্তে ঋকের প্রবেশ]

ঋক : কখন এসেছো কাকু? আমার জন্য কী এনেছো? আমি মাকে ক্যাডবেরি আনতে বলেছিলাম। চকোলেট কমপ্লান এনেছো? ফ্রুটি কি এনেছো?

রতন : সব এনেছি ঋক। ব্যাগের মধ্যে আছে। তোমার পড়াশুনা ঠিকঠাক চলছে তো! [ঋক মাথা নাড়ায় ইতিবাচক হিসেবে এবং দ্রুত প্রস্থান করে।]

রমা : শোনো রমা, তোমার জন্য একটা শাড়ি এনেছি। তোমার পছন্দ হবে কি?

রমা : হ্যাঁ, পছন্দ হবে। আমি আর পেরে উঠছি না রতন। নানাভাবে আমাকে চারপাশের পরিবেশ বিরক্ত করছে। কেন আমি একা একা থাকছি? বিয়ে করতে আমার ইচ্ছে নেই কেন? আমার অর্থনৈতিক চাপ সব কেটে যাবে, যদি আমি তাদের কথা শুনে চলি। সকাল-সন্ধ্যা মাঝরাত সব সময় ফোন। একদিকে নিজের সংসারের চাপ, অর্থনৈতিক অসুবিধা, স্কুলের প্রতিকূল পরিবেশ, অন্যদিকে লোভী মানুষদের আক্রমণ।

রতন : শোনো রমা, তোমাকে কঠোর থাকতে হবে। কোনোভাবে প্রলোভনে পা দেবে না। তাহলে তোমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। এরা হল কীটপতঙ্গ। আর তুমি গাছে পেকে থাকা ফল। যেহেতু স্বামী নেই, সেহেতু গাছ পাহারা দেবার কেউ নেই। তোমাকে নিজেকেই নিজের প্রতিরক্ষা করতে হবে। যারা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসছে, ভেবে দেখো, এটা প্রকৃতই অন্তর থেকে কিনা? ভালোবেসে তুমি ফের বিয়ে করতে পারো। যদি সে ঋকের দায়িত্ব নেয়, তোমার দায়িত্বও নেয়। অথচ তোমার সম্পত্তির ওপর তার কোনো লোভ থাকবে না।

রমা : না, বিয়ে আর নয়। এখন ভাবছি একরকম। তারপর নতুন জীবনে যদি আবার অন্য সমস্যা মারাত্মক হয়ে ওঠে! যদি সে কিছুদিন পর সব ছেড়েছুড়ে চলে যায়, অথবা কোনো ক্ষতি করে বসে! তার চেয়ে এই বেশ। ঋককে নিয়ে আছি। যতই ঋক বেয়াড়া হোক না কেন, যতই ও কথা না শুনুক, কী আর করা! শোনো, ঋক যদিও বলছিল, মা তুমি বিয়ে করো। সে বাবার মতো আমার জন্য নানারকম খাবার নিয়ে আসবে। মাছ-মাংস নিয়ে আসবে। আমরা তো কতদিন মাছ খাই না, মাংস খাই না। আমি তার সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাব। কিন্তু শোনো, আমি রাজি না থাকায়, ঋক বলে তবে তুমি কাকুকে বিয়ে করো। কাকু আমাদের বাড়িতে থাকুক। আমরা আনন্দে দিন কাটাব।

রতন : সত্যি, ঋকের কত স্বপ্ন। আসলে ও ভীষণ একা, অসহায়। ওর একজন পুরুষ গার্জিয়ান দরকার। তোমাকে বিয়ে করতে তো আমিও চাই। কিন্তু আমারও যে সংসার, স্ত্রী-সন্তান আছে। তাদের তো বঞ্চিত করতে পারি না।

[হঠাৎ রমার মোবাইল বেজে ওঠে। রমা প্রকৃতিস্থ হয়ে মোবাইল কানে দেয়]

রমা : হ্যাঁ বলুন সত্যদা, কী বলছেন, ইনশিয়োরেন্সের সব ব্রিফগুলো আপনাকে দিয়ে দেব? না, আগে আমাকে ইনশিয়োরেন্স টাকা দিক। কী বললেন, ইনশিয়োরেন্স চিঠি করেছে! সব ব্রিফ দিয়ে দিতে হবে! দেখুন সত্যদা, সুধাময়ের সব পরিশ্রমের ফসল আপনি খাবেন, আর অসহায়

আমাকে বঞ্চিত করবেন, এ কেমন বিচার? স্বর্গীয় বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি আপনার কি কোনো কর্তব্য নেই? আপনার কি বিবেকবোধ নেই? একজন অসহায় বিধবাকে সাহায্য করা তো দূরের কথা, তার ক্ষতি করতে আপনাদের হাত কাঁপে না! সত্যি, কোন যুগে বাস করি আমরা!

[ধীরে ধীরে মঞ্চের আলো নিভে আসে]

তৃতীয় দৃশ্য

[বেডরুম। ঋক বই পড়ছে। ঘড়িতে বাজে সন্ধে সাতটা] [তরল খাদ্য ভরতি গেলাস নিয়ে রমার প্রবেশ]

রমা : বাবু, দুধটা খেয়ে নাও। কী পড়ছো? জিয়োগ্রাফি? পড়ো মন দিয়ে। মাস্টার হয়তো এখনই আসবে।

[হঠাৎ রমার মোবইল বেজে ওঠে। রমা মোবাইল কানে দেয়।]

রমা : হ্যাঁলো, মা বলছো? কেমন আছো? আমরা? আমরা আছি, ভগবান যেরকম রেখেছে! কী বললে, বুল্টি আমাদের বাড়িটা নিয়ে নেবে? কেন, আমিও তো তোমার মেয়ে। ও অর্ধেকটা নেবে? এবাড়ির অর্ধেক কী করে করবে? আচ্ছা, তাহলে পুরো বাড়িটাই নেবে! আমরা কোথায় যাবো? শ্বশুরবাড়ি? সেখানে আমাদের থাকতে দেবে না। সুধাময় চলে যাবার পর ওরা একরকম ভদ্রভাবে বের করে দিল ওই বাড়ি থেকে। কী বললে, ওদের পা ধরে ওই বাড়িতে থেকে যাবো? আমার সব মাইনেও তুলে দেব? ওরা যদি খেতে না দেয়, ছেলেকে নিয়ে কী খাব? কী বললে, গাছতলায় থাকব? তবুও বুল্টিকে এই বাড়িটা দিয়ে দিতে হবে? ওর হাজব্যান্ড চাপ দিচ্ছে? কলকাতার বাড়িটা ওদের দিয়ে দাও। তোমাদের অবর্তমানে ওরাই তো নিয়ে নেবে ওই বাড়ি। তবুও ওদের এই বাড়িটা চাই?

[হঠাৎ কলিং বেল বেজে ওঠে। ঋক গিয়ে দরজা খুলে দেয়। মাস্টারের প্রবেশ]

মাস্টার : কী গুডবয়? পড়া হয়েছে?

[মাস্টার তার নির্ধারিত চেয়ারে বসে। ঋক উৎফুল্লিত হয়ে মাস্টারকে বলে]

ঋক : মাসাই, আমরা বেড়াতে যাব। কাকু বলেছে, মা আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে।

মাস্টার : সে তা ভালো কথা। এখন তো তোমার পরীক্ষা সামনে। পরীক্ষার পড়া করো। পরীক্ষা হয়ে গেলে বেড়াতে যেয়ো।

রমা : ঋক এখন মন দিয়ে পড়ো। পড়ার সময় কথা বলতে নেই। যখন বেড়াতে যাবে, তখন নিশ্চয়ই যাবে। মাস্টার, দেখ তো, ঋক নতুন অঙ্কগুলো ঠিকমতো পারছে কিনা?

[হঠাৎ মোবাইল বেজে ওঠে, রমা মোবাইল কানে দেয় এবং ঋক ও মাস্টারের থেকে কিছুটা দূরত্বে চলে আসে।]

রমা : হ্যাঁলো, কে বলছেন? ও, কাউন্সিলর সাহেব! বলুন, মিউনিসিপ্যালিটি অফিস থেকে ওই কাগজটা দিয়েছে? ধন্যবাদ! অ্যাঁ, পাঁচশো টাকা দিতে হবে! আচ্ছা, আমি দিয়ে আসব। ও, আপনি আসবেন, কাগজটা নিয়ে? আচ্ছা আসুন একদিন, চা খেয়ে যাবেন। কী বললেন, শুধু চা দিয়ে হবে না? আচ্ছা, ঘরে যা আছে তাই দেব? কী, আপনি ওইসব চান না? তবে কী চান? টাকা? টাকাও চান না? কী? (বিরক্তি সহ), আপনি এমন কথা বলতে পারলেন? আমি রাখছি। না, না, আমি এ বিষয়ে কিছু ভাবছি না।

[রমা ফোনটি কেটে দেয়]

হায়রে ভগবান, কাকে আমি ভরসা করব? পৃথিবীতে কি কেউ নেই, যে অন্যভাবে আমাকে দেখবে? আমার শ্রদ্ধার মানুষ হবে? কার ওপরে আর ভরসা রাখব ঈশ্বর?

[কথা শেষ করে রমা ঋক ও মাস্টারের কাছে চলে আসে।]

রমা : মাস্টার, আরও কিছুক্ষণ আছো তো? শোনো, আগামী রবিবার আমরা দেবগ্রাম যাব। সুধাময়ের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতে। তুমি ওইদিন রাতে আমাদের বাড়িতে থেকো। নয়তো ফাঁকা বাড়িতে চোর ঢুকতে পারে। আমি তোমার জন্য রান্না করে ফ্রিজে রেখে দেব। তুমি শুধু ওভেনে গরম করে নিয়ো। আমরা সোমবার বিকেলে ফিরে আসব।

(আলো নিভে আসে)

চতুর্থ দৃশ্য

[রমার শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুরবাড়িতে উপস্থিত শাশুড়ি, দুই ননদ ও এক দেওর]

[সুধাময়ের মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠান। পুরোহিতের মুখোমুখি বসে রয়েছে রমা। রমার চুল ভেজা। স্নান করে নতুন সাদা শাড়িতে বসে। দুজনের মধ্যিখানে শ্রাদ্ধের সব উপকরণ। সুধাময়ের প্রিয় জিনিস, বই, চাদর, ছাতা ইত্যাদি রাখা আছে। পুরোহিত পিণ্ডদানের জন্য গোলাকৃতি পিণ্ড প্রস্তুত করছে। দুজনকে ঘিরে বসে রয়েছে রমার শাশুড়ি ও দুই ননদ]

পুরোহিত : বউমা, সুধাময়ের উদ্দেশে মন্ত্র পড়ো। তাকে যেন সাক্ষাৎ দেখতে পাচ্ছো, যেন তার উদ্দেশেই এগুলো করছো। এই মুহূর্তে পৃথিবীর সব মিথ্যা, শুধু সত্য হল, তুমি সুধাময়ের স্ত্রী। তার জন্য উৎসর্গ কর তার প্রিয় দ্রব্যাদি, তার জন্য নিজেকেও উৎসর্গ কর আর মন্ত্র পড়তে থাকো। এই নাও, দুই হাতে নাও গঙ্গাজল, চাল, তিল, দূর্বা।

[রমা গভীর মমতা মাখানো চোখে মন্ত্র পড়তে থাকে নির্লিপ্ত ভাবাবেগে। তারপর পুরোহিতকে বলে]

রমা : ঠাকুরমশাই, এই ছাতা, বই, চাদর, আপনাকে দিলাম। ওর প্রিয় ঘড়িও আপনার জন্য এনেছি। [আঁচলের গিঁট খুলে একটি ঘড়ি পুরোহিতের হাতে তুলে দেয়।]

শাশুড়ি : (রাগতভাবে) বউমা, ঘড়িটা সুধাময়ের স্মৃতি। এটা রেখে দাও আমার কাছে। আমি সুধাময়ের ছবির কাছে রেখে দেব।

পুরোহিত : পুরোহিতকে দান করা দ্রব্য ফেরত নিতে নেই।

[দ্রুততার সঙ্গে পুরোহিত ঘড়িটি থলেতে ঢুকিয়ে নেয়]

শাশুড়ি : তুমি তো বেশ বেয়াড়া আছো বউ। ঘড়িটি ওকে দিয়ে দিলে? আমাদের ছেলেটাকে খেয়েছো, আবার ছেলেটার প্রিয় এই হাতঘড়িটা দান করে দিলে? ঘড়িটা সুধাময়ের। তোমার কোনো অধিকার নেই ঘড়িটার ওপর।

রমা : শুনুন মা, ঘড়িটা আমার মা উপহার দিয়েছে সুধাময়কে। সেই হিসেবে ঘড়িটা কিন্তু আপনার অধিকারের বস্তু নয়।

শাশুড়ি : তুমি তো বেশ বুঝে গেছো অধিকারবোধ। জানো, এই বাড়িতে তোমাকে আমরা আর ঢুকতে না-ই দিতে পারি। সুধাময় নেই, তোমারও এখানে আসা আর চলবে না। জীবনে তো কারও প্রতি দায়িত্ববোধ দেখালে না। সুধাময়ের প্রতিও কর্তব্যবোধ দেখালে না।

রমা : মা, আমি কিছুই দেখাই না। আমি আমার দায়িত্ববোধ কাজের ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণ করি। যেমন পুরোহিত দাদাকে ঘড়িটা দিলাম এই ভেবে যে, সুধাময়ের আত্মা এই কাজ দেখে তৃপ্ত

হবে।

প্রথম ননদ : খুব বড়ো বড়ো কথা বলছো বউদি। তুমি জানো, আমরা কিন্তু তোমাকে আর তোমার ছেলেকে আমাদের সংসার থেকে ত্যাগ করেছি! তুমি যে কী কুলক্ষণে আমাদের বাড়িতে এসেছিলে! দাদা যেন তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে নেয় খুব তাড়াতাড়ি। তোমার এই মুখ আমাদের কাছে অসহ্য। এখান থেকে ফিরেই তুমি তোমার বাড়ি গিয়েই আবার ধিঙ্গিপনা শুরু করে দেবে।

দ্বিতীয় ননদ : আমরা কিছু বুঝি না বউদি? তুমি তো ঋকের মাস্টারের সঙ্গে ফস্টিনস্টি শুরু করে দিয়েছ। তোমার লজ্জাও করে না, আমাদের বাড়িতে এসে তোমার মুখ দেখাতে?

রমা : শোন, আজ সুধাময়ের মৃত্যুবার্ষিকী। এই দিনে অন্তত তোমরা নম্র, সংযত থাকবে, এটাই ভেবেছিলাম। না, এখন দেখছি তোমরা আগের মতোই আছো। আমার মাইনেয় তোমরা সংসার চালিয়েছো। আমার বাবার টাকা আত্মসাৎ করে সুধাময় তোমাদের বিয়েতে ঢেলেছে, সে কি আমি জানি না? আর আজ, তোমরা সবাই সেই দিন ভুলে গেছ!

শাশুড়ি : বড্ড বড়ো বড়ো কথা। বেশি কথা বোলো না। জানো আমি অনেক কিছু করতে পারি?

রমা : সে তো জানি। আপনি সুধাময়কে স্থিরভাবে বাঁচতে দেননি। সব সময় ওর ওপর মানসিক অত্যাচার করতেন। যাতে ও নিজের স্ত্রী-পুত্রের দায়িত্ব নিতে না পারে। সব সময় আপনাদের চাহিদা মেটাতেই ও ব্যস্ত থাকত।

পুরোহিত : এটা মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠান। আপনারা এখানে সংসারের নোংরা আবর্জনা ছড়িয়ে দিচ্ছেন? এতে তো সুধাময়ের আত্মার শান্তি হবে না।

[হঠাৎ ঋকের প্রবেশ। কান্না করতে করতে]

রমা : কী হয়েছে ঋক?

ঋক : আমাকে পিসির ছেলে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিয়েছে। অনেক কষ্টে [কান্না করতে করতে] পুকুর থেকে উঠেছি। আমার পেটেও জল ঢুকে গেছে।

[রমা বিচলিত হয়ে ঋককে জড়িয়ে ধরে কান্না করতে থাকে। মঞ্চের আলো নিভে আসে]

পঞ্চম দৃশ্য

[কুড়ি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ঋক এক কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ঋকের বউ-এর নাম মৌ আর ছেলের নাম অর্ক। অর্কের বয়েস ছয় বছর]

[ঋকের বসবার ঘর। ঘরে আভিজাত্যের ছাপ। মৌ বসে আছে ছেলে অর্ককে নিয়ে। অর্ক খেলা নিয়ে ব্যস্ত। নানারকম খেলনা ছড়িয়ে আছে অর্কের সামনে।]

মৌ : অর্ক, অনেক সময় খেলেছো। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এবার তোমাকে পড়তে হবে বাবা। আমি বই নিয়ে আসছি।

অর্ক : না, আমি পড়ব না। আমি এখন খেলব। আমি গাড়ি চালাই। মা, আমি বড়ো হয়ে গাড়ি চালাব।

[রমার প্রবেশ। বয়স এখন তেষট্টি। চুলে পাক ধরেছে। চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে।]

রমা : বাবুসোনা, কী করছো? খেলছো? বল তো বাবুসোনা, একটা ছড়া বল তো? তোমার বই থেকেই বলো।

আপনাকে বড়ো বলে বড়ো সেই নয়
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।

অর্ক : না ঠাম্মা, আমি ছড়া বলব না, কবিতাও বলব না। আমি তোমার কাছে গল্প শুনব।

মৌ : না অর্ক, এখন গল্প শোনার সময় নয়। এখন বই পড়ার সময়।

আমার সঙ্গে সঙ্গে বলো —

টুইঙ্কিল টুইঙ্কিল লিট্‌ল স্টার
হাউ আই ওয়ান্ডার, হোয়াট ইউ আর
আপ অ্যাবোভ দা ওর্য়াল্ড সো হাই
লাইক এ ডায়মন্ড ইন দ্যা স্কাই

অর্ক : আমি কোনো রাইমও বলব না এখন। আমি এখন ঠাম্মার কাছে গল্প শুনব। বলো ঠাম্মা, সেই পাতালপুরীর রাজকন্যার গল্প বলো, যে দৈত্যদের কাছে বন্দি ছিল।

[এমন সময় অফিস ফেরত ঋকের প্রবেশ। ক্লান্ত দেহে সোফায় এলিয়ে বসে ঋক। মৌ হাতের ব্রিফকেসটা নিয়ে টেবিলে তুলে রাখে। গলার টাইটা খুলে দেয়। টেবিলে রাখা ঢাকা দেওয়া জলের গেলাসটা এগিয়ে দেয় ঋককে।]

মৌ : নাও, জল খাও। আমি চা করে আনছি।

রমা : ঋক, আমি বরং ঠান্ডা জল দিয়ে শরবত করে আনছি?

ঋক : না মা, শরবত আর আজ খাব না। তুমি বসো। বিশেষ কথা আছে মা।

মৌ : আমি চা নিয়ে আসছি।

ঋক : চা-ও এখন খাব না। বরং বসো এখানে। আমার ট্রান্সফার অর্ডার এসে গেছে। চেন্নাইতে। কী করব বুঝতে পারছি না।

মৌ : চাকরি যখন করতে হবে, তখন তোমাকে অর্ডার অনুযায়ী কাজ তো করতেই হবে।

[ঋক বিমর্ষ হয়ে পড়ে। রমাও বেশ বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। বরং মৌ-এর চোখে উৎফুল্ল ভাব]

অর্ক : মা, আমরা কি বেড়াতে যাব? কোথায় যাব বলো না!

মৌ : না বাবা, বেড়াতে যাব না। বাবার চাকরি অন্য জায়গায় চলে গেছে। আমরা সেখানে যাব।

অর্ক : বাঃ, বাঃ, আমরা অন্য জায়গায় যাব। ঠাম্মা, তুমি তোমার কাপড় গুছিয়ে নাও। দেরি করলে তুমি কিন্তু পড়ে থাকবে।

ঋক : আমি সেই কথাই ভাবছিলাম। মা, এই বুড়ো বয়সে ওই দূর অচেনা জায়গায় কীভাবে থাকবে? মায়ের কষ্ট হবে। মা বরং বহরমপুর বৃদ্ধাবাসে থাকুক। মাঝে মাঝে এসে বাড়িটাও দেখে যাবে? আর আমি তো দু-তিন মাস পরপর এখানে আসব, মা, তোমাকে দেখতে, কেমন থাকছো। নাঃ, নাঃ, মা তোমার ভালোই লাগবে। ওই বৃদ্ধাবাসে আমার বন্ধুর মা থাকেন, গত পাঁচ-ছ বছর তিনি তো ভালোই আছেন।

[বৃদ্ধা রমা ঋকের কথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। সবার অজান্তে ওর দুগাল বেয়ে নেমে আসতে থাকে জলধারা]

ঋক : মা, তুমি সবার সঙ্গে মনের আনন্দে থাকবে। সবার সঙ্গে বাকি জীবন দেখবে, অন্য একরকম আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শে নিজেকে মাতিয়ে রাখতে পারবে। আর আমি তো রোজ দুবেলা মোবাইলে তোমার খোঁজখবর নেব।

অর্ক : না বাবা, আম্মা আমাদের সঙ্গে থাকবে। আম্মার কাছে ভূত আর পরিরা আছে। আমি

সেই ভূতের গল্প শুনব, পরির কাহিনি শুনব। আম্মার কাছে অঙ্ক শিখব। আম্মার মতো অঙ্ক কে শেখাবে বলো? [অর্ক দৌড়ে গিয়ে রমার বুকের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করে]

[রমা আর স্থির থাকতে পারে না। অর্ককে জড়িয়ে কেঁদে ফেলে। এ কান্নার বাঁধ মানে না। বাইরে তখন মুশলধারে বৃষ্টি হতে থাকে, বৃষ্টির শব্দে রমার চাপা কান্না চাপা পড়ে যায়।]

রমা : বাবুসোনা, তুমি কেঁদো না। তুমি এখন বাবা-মায়ের সঙ্গে চলে যাও অন্য কোথাও। আমার কথা ভেবো না। আমি বুড়ো হয়েছি। এর পর আরও বুড়ো হব। আমি তো তোমাকে কোলে নিতে পারব না। তোমাকে আদর করতে পারব না। আমি দুর্বল হয়ে যাব। রোগে পড়ে থাকব বিছানায়। কী করে আর তোমাকে আদর করব বাবুসোনা? তুমি নতুন জায়গায় নতুন স্কুলে যাবে। নতুন বন্ধু পাবে। তারা তোমাকে ভালোবাসবে। সেখানে দেখবে কত বড়ো বাগান। সেই বাগানে কত রঙের কত সুন্দর ফুল ফুটে থাকবে। তুমি ওই ফুলগুলির সঙ্গে ভাব জমাবে। আর যদি দেখো, গাছের নীচে একটি শুকনো ফুল পড়ে আছে, সেই ফুলটাকে নিয়ে রেখো তোমার কাছে। মনে করবে, ওই ফুলটা তোমার ঠাম্মা। যে এখনও তোমার দুই ছোট্ট হাতের মধ্যে থেকে যেতে চায়।

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়]

শেষ দৃশ্য

[বৃদ্ধাবাস। আবাসের কমন রুম; যেখানে সব আবাসিকদের বসবার অধিকার আছে। দুটি চেয়ারের একটিতে রমা এবং অন্যটিতে রতন। এছাড়া দু-তিনটে চেয়ার ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে।]

রতন : আজ তোমার জন্মদিন। মনে রেখেছো, না ভুলে গেছ? এই নাও তোমার জন্মদিনের উপহার।

[রতন পাশে রাখা প্যাকেট খোলে। বন্ধ অবস্থায় বোঝা যায়নি ওর ভেতরে কী আছে। প্যাকেট খুলে বহুবর্ণ গোলাপের একটি স্তবক রমার হাতে তুলে দেয়। রমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বৃদ্ধ রতন ব্লেজারের পকেট থেকে সুদৃশ্য ছোটো প্যাকেট বের করে। প্যাকেট খুলে সুন্দর একটি আংটি এগিয়ে দেয় রমার দিকে। রমা ইতস্তত করে। অতঃপর আংটিটা হাতে তুলে নেয় এবং দুজনেই ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে। নির্বাক রমার দুচোখ বেয়ে টপটপ করে জলের ধারা পড়তে থাকে। কথা বলার অবস্থায় আর নেই রমা। ধীরে ধীরে চেয়ারে বসে পড়ে। আঁচল দিয়ে চোখ মোছে রমা। গলা বসে যায়। আর নির্বাক ছবির মতো স্থির হয়ে যায়। ধীরে ধীরে রমা আর রতনের ওপর আলো কমে আসতে থাকে। মঞ্চের অন্য পাশে উজ্জ্বল আলোয় দেখা যায় ২০ বছরের রমার বুক চাপা আর্তনাদ। পাশে ওর কঠোর কঠিন মা ও বাবার গর্জনের কোরাস।]

রমার মা : তোকে বলেছি এখন তোর পড়াশোনার বয়েস। পড়াশোনা ছাড়া অন্য বিষয়ে নজর দিবি না। কেন তোর প্রাইভেট টিউটর তোর সঙ্গে গল্প করে? ওকে বলবি পড়ার বাইরে কোনো কথা যেন সে আলোচনা না করে।

রমা : উনি আমাদের কলেজের অধ্যাপক। ভীষণ ব্রিলিয়ান্ট। মাত্র আটাশ বছরেই চাকরি পেয়েছেন। স্যারের ব্যাচে আমরা সাতজন একসঙ্গে পড়ি। উনি এত ভালো পড়ান, কেউ আর ওনার ব্যাচ ছেড়ে দিতে চায় না। আমি অন্য ব্যাচে পড়তেই পারি। কিন্তু স্যার বলেছেন, তুমি

ঠিকমতো গাইড পেলেই ফার্স্টক্লাস পেয়ে যাবে। অন্য ব্যাচের প্রফেসর এত ভালো পড়ায় না মা।

মা : কিন্তু পড়ার বাইরে অন্য কথা যেন তার সঙ্গে না হয়, বলে রাখছি।

রমা : না, মা। উনি শুধু বলেছেন, আমি একদিন তোমাদের বাড়ি যাব। তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলব।

[কথা শেষ হতেই রমার মা রমার চুলের মুঠি ধরে হ্যাঁচকা টান মারে। আর রমা আর্তনাদ করে ওঠে।]

মা : তোর আর পড়তে হবে না। কলেজে যেতে হবে না। দু'মাসের মধ্যেই তোর বিয়ের ব্যবস্থা করছি।

[রমা আর্তনাদ করতে করতে মাটিতে শুয়ে পড়ে। তীব্র কান্নার আওয়াজে মঞ্চের পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে আলো নিভে আসে।]

[সেই স্থানেই আলো জ্বলে ওঠে পুনরায়। সুশ্রী লক্ষ্মীমতি বউ উল বুনছে। পাশে ওর স্বামী সুধাময়। উকিলের কালো পোশাক খুলে, চেয়ারে বসে পড়ে।]

সুধাময় : রমা, উল দিয়ে কী বুনছো?

রমা : তোমার জন্য সোয়েটার। নতুন একটা ডিজাইন দেখেছি। ভাবছি সেই ডিজাইনটা তোমাকে ভালোই লাগবে। তুমি বসো, আমি চা করে আনি।

সুধাময় : না, আমি সত্য-র বাড়ি গিয়েছিলাম। সেখানে চা খেয়ে এসেছি। শোন রমা, আগামীকাল দেবগ্রাম যাবো। শীত আসছে তো, মা, বোন, ভাইদের জন্য নতুন উলের পোশাক নিয়ে যাব। ওরা বলছিল, নতুন সোয়েটার ছাড়া কীভাবে বেড়াতে যাবে এই শীতে?

রমা : কোথায় বেড়াতে যাবে?

সুধাময় : দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে যাব। ওখানে উলের পোশাক লাগবে না। কিন্তু উটি পাহাড়ে কয়দিন থাকতে হবে, বোনের ইচ্ছে। সেই জন্য নতুন সোয়েটার দরকার।

রমা : কে কে যাচ্ছে বেড়াতে?

সুধাময় : কেন, প্রতিবছর যেমন যাই। আমি, মা, ছোটো বোন, ছোটো ভাই আর নয়না বউদি।

রমা : তোমার তো অনেক জায়গায় বেড়ানো হল, ঋক কিন্তু বলছিল ...

সুধাময় : কী বলছিল? বেড়াতে যাবে? দেখো ঋক যখন ছিল না তখনও তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারিনি, এখনও পারবো না। মা-বোনদের নির্দেশ। আসলে আমি চাই না, আমাদের মধ্যেখানে তুমি বা তোমার ছেলে ঢুকে পড়ো।

রমা : ঋক তোমার ছেলে নয়?

সুধাময় : আমি তো চাইনি যে আমাদের সন্তান হোক। তোমার ইচ্ছা আর তোমার বাবা-মায়ের জেদাজেদির জন্য বাধ্য হয়েছি ঋককে আনতে। আমি চাই না, তুমি বা তোমার ছেলের জন্য আমাদের মধ্যে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হোক।

[রমা দুই হাতের তালু দিয়ে মুখ ঢাকে। রমার নীরবতার কাছে সুধাময়ের কোনোরকম হতাশা প্রকাশ পায় না। সুধাময় কোনো এক আনন্দে নিজেকে তন্ময় করে রাখে। টেবিলের ওপর ঋকের একটি খেলনাগাড়ি ছিল। সুধাময় বাচ্চাছেলের মতো ওই গাড়িটা চালাতে থাকে। গাড়িটা ঠেলে দ্যায় আর তার পিছনে ছুটতে থাকে আর বাচ্চাদের মতো আনন্দে যেন নেচে ওঠে। ধীরে ধীরে আলো কমে আসে। রমাকে আর দেখা যায় না। মঞ্চের মধ্যেখানে সুধাময়ের আনন্দে উজ্জ্বল মুখটাতে আলো এসে পড়ে। যেন অন্ধকার রাতে কলঙ্ক মাখানো এক গোলাকার

চাঁদ]

[ধীরে ধীরে মঞ্চের আলো জ্বলে ওঠে। বয়স্ক রমা বসে আছে। বসে আছে প্রৌঢ় রতন]

রমা : বলো রতন, কী পেলাম আমি এই দীর্ঘ জীবনে? শুধু দেবার জন্যই আমাকে সৃষ্টি করা হল? আমার জন্য পাবার কি শুধুই বঞ্চনা, মানসিক অত্যাচার আর বিস্তীর্ণ মরুভূমির বিষাক্ত জন্তুদের আক্রমণ? জীবনের শেষ প্রান্তেও এসে রয়ে গেলাম অপাঙ্‌ক্তেয়, ভাগ্যহীন, বর্জিত। কারও কাছে আমার জন্য নেই সুবিচার। মা-বাবা, তারা তো আমার একান্ত নিজের। তাদের কাছে পেলাম না ইচ্ছে প্রকাশের স্বাধীনতা। তাদের ইচ্ছের কাছে বলি দিলাম নিজের দীর্ঘ জীবন। কেন এমন হয় বলো তো রতন? বাবা-মায়ের ইচ্ছেয় যার কাছে এলাম, কী পেলাম আমি তার কাছ থেকে? ভালোবাসা বস্তুটা কী তা তো তার কাছে জানতেই পারলাম না। সে কেন যে আমাকে বিয়ে করল, আজও বুঝতে পারিনি। নিজের চেষ্টায় যদি সামান্য এই চাকরিটা না পেতাম, তবে তো শ্বশুরবাড়ির বিশাল সংখ্যক মানুষের ক্রীতদাস হয়েই থাকতে হত। তারা আমার স্বামীর উপার্জনে আনন্দেই ছিল আর আমি ছিলাম তাদের সারাদিনের সব ধরনের কাজের একান্ত নীরব এক দাসী। আর স্বামীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাকে গর্ভ ধরলাম, সেও যেন বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন পালটে যেতে লাগল। তার ধারণা ছিল, তার বাবাই তাকে ভালোবাসে, অনেক কিছু কিনে দেয়। বাবার মৃত্যুর পর দিন দিন সে ক্রমশ জেদি হয়ে উঠল। প্রচণ্ড মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে, সব প্রতিকূলতাকে দূরে সরিয়ে, নিজের সামান্য ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে এই ছেলেকে বড়ো করে তুললাম। তথাকথিত মানুষ করে তুললাম। আর সে তার নিজের অতীতকে ভুলে গেল? সে কি বেমালুম আমাকে বৃদ্ধাবাসে গচ্ছিত রেখে, নিজের জীবন আনন্দে, পূর্ণতায় ভরিয়ে নিতে ভুলে গেল অসহায় মায়ের অস্তিত্ব? [রমার গলা কান্নায় ভারী হয়ে আসে]

রতন : রমা, তুমি আর এসব কথা ভেবে কষ্ট নিয়ো না। ভুলে যাও তোমার অতীত? অন্তত চেষ্টা করো। আজ থেকে তুমি আর একা নও রমা। এই বুড়ো বয়সে চলো দুজনে একসঙ্গে থাকি। পুরীর সমুদ্র পাড়ে আমি দুই রুমের একটা ফ্ল্যাট কিনেছি। সেখানে আমরা বাকিটা জীবন কাটিয়ে দেব, সমুদ্র সঙ্গে নিয়ে। দেখো, সমুদ্র কী বিশাল, সে কত প্রাণীকে আশ্রয় দেয়, অথচ যে তার নয়, সমুদ্র তাকে কিন্তু ফিরিয়ে দেয়। চলো রমা, অবশিষ্ট দিনগুলি তোমার মধুর গলার রবীন্দ্রসংগীত শুনে কাটিয়ে দেব।

[রমা তার মিষ্টি গলায় শুরু করে তার অন্তরের সেই রবীন্দ্রসংগীত]

রমা : আজি দখিনা দুয়ার খোলা ...

পর্দা নেমে আসে।